উপসংহার

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্ম যে সব শিল্পীর হাত ধরে হচ্ছিল তাতে বুদ্ধদেব ছিলেন একাধারে শিল্পী এবং ধাত্রী। তিনি যেমন নিজে নূতন কালের সাহিত্য রচনা করছিলেন তেমনি তাঁর কালের শিল্পীদের একটি পত্রিকার সংগঠিত প্রয়াসের মধ্যে এনে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার পর্বান্তরের ঘোষণা করেছিলেন। এদিক থেকে তাঁর ভূমিকা দ্বিবিধ। তিনি বাংলা সাহিত্যের নূতন নূতন প্রতিভার সন্ধান করছিলেন এবং নূতন নূতন প্রবনতার উন্মোচন করে বাংলা সাহিত্যেকে একটা নূতন কালের দিশা এনে দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের লেখায় একদিন প্রকাশিত হয়েছিল নূতন কালের মানবাত্মার ক্রন্দন। প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী, আবার তারই ভিতরে থাকে অমৃতের পিপাসা। আর সেই পিপাসা থেকে কবি নিজেকে সৃষ্টি করেছেন "মোরে আপনারে আমি নবজন্ম করিয়াছি দান" (বন্দীর বন্দনা, ডি.এম.লাইব্রেরী, ১৯৬২, পৃঃ ২৯)। প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী আত্মসত্তাকে তিনি নিজেই মুক্ত করেছেন। এই মুক্তিই তাঁর শিল্পী সত্তার সৃষ্টি।

বুদ্ধদেবের কাব্য এবং সমালোচনাকে এই কারনে মনে করি একই শিল্পী সত্তার দুই মুখ - কিন্তু দুইয়েরই লক্ষ্য এক। দুইয়েরই পরিপুষ্টিতে গড়ে উঠেছে শিল্পী সত্তার এক অনির্বাণ জ্যোতি - যাকে বলা যায় শিল্পী বুদ্ধদেব। শিল্পী বুদ্ধদেবের যে সত্তা,তার সৃজনশীলতার আর একটি রূপ সেই সমালোচক বুদ্ধদেব বসুকে তাই কবি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায় না। আর এখানে অনিবার্যভাবে এক ঐতিহ্যের কথা চলে আসে। একদিন প্রাজ্ঞ এলিয়ট বলেছিলেন কবিরাই কাব্যের উত্তম সমালোচক - তাঁরাই কাব্য যথার্থ অনুধাবন করেন এবং সমালোচনা করেন - অন্যদের সম্বন্ধে তাঁর ধারনা খুব সদর্থক নয়। যদিও পরবর্তীকালে এই ধারনা তিনি আর অনুসরণ করেননি। তথাপি তাঁর প্রতিপাদ্যের সত্যতা তাতে কিছু ক্ষুণ্ণ হয়না। বুদ্ধদেবকেও বলতে পারি সেই অর্থে কবি সমালোচক। এলিয়ট লিখেছিলেন কবি সমালোচক তিনিই যিনি তাঁর সৃষ্টির ইন্ধনরূপে কাব্য সমালোচনা করেন আর তারই ভিতর থেকে তাঁর নূতন সৃষ্টির সম্ভবনা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেবের লেখায় সমালোচনার মধ্যে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা কতটা উদঘাটিত হয়েছে বলা যায় না। তবে একথা বলা যায় তিনি কাব্য সমালোচনা করেছেন তাঁরই কাব্যে সৃজনশীলতার একটি অঙ্গ হিসেবে। রবীন্দ্র সমালোচনার ভূমিকা হিসেবে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন " বহু দিনের সঞ্চিত এবং অনবরত পরিবর্তমান ভাবনাগুলিকেও অন্তত নিজের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে " তিনি এই সমালোচনাগুলি লিখতে শুরু করেছিলেন। আর এইভাবে সৃজনশীলতার সঙ্গে ভাবনার ক্রমাগ্রসর এক সন্ধিতে তাঁর এই প্রবন্ধগুলি রচিত হয়েছিল। বুদ্ধদেবের সৃজন সাহিত্য একদিকে ছিল নিজের সৃষ্টিতে তাঁর ক্রমাগ্রসরতা আর তাঁর সমালোচনার লক্ষ্য ছিল তাঁর কালের বাংলা সাহিত্যকে এক নূতন কালের চেতনায় অভিসিক্ত করা।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে বুদ্ধদেব কী এনেছেন ? প্রথমেই এর স্পষ্ট উত্তর দেওয়া যায় না। আমরা যদি দেখি রবীন্দ্রনাথের যে চিরন্তন আনন্দবাদী সাহিত্য তত্ত্ব - রোমান্টিকতা উন্মুখ যে সাহিত্য ভাবনা সেই ভাবনার ঢেউই চলে এসেছিল প্রাক্ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল পর্যন্ত। সেই পর্বে যাঁরা রবীন্দ্র বিরোধী তাদের দুটো মুখ

ঃ একদল প্রাচীন সমালোচক একদল নবীন। কিন্তু প্রাচীন বা নবীন যাই হোক উভয় শ্রেণীর সমালোচনাতেই আছে রবীন্দ্র সাহিত্যের বস্তুভারহীনতার অভাবের কথা আর অন্যদিকে অভিযোগ মায়িকতার এবং অযথার্থ কথনের অপ্রশংসা। একদিকে এসেছে বাস্তবতার অভাবের কথা অন্যদিকে নীতি দুর্নীতির প্রশ্নে নানা তর্ক বিতর্ক। এই তর্কবিতর্কে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেই চিরন্তন মঙ্গলের প্রশ্নকেই সাহিত্যের শেষ লক্ষ্য বলে রায় দিয়েছিলেন। ১৩২১ সালে লেখা বাস্তব বা ১৩২২ সালে লেখা কবির কৈফিয়ত সেই আনন্দবাদেরই তত্ত্ব প্রতিপাদন। এই তত্ত্ব চিন্তার মৌল পরিবর্তন তার পরেও হয়নি।

এরই মধ্যে বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমের খোলা হাওয়া যে ভাবে ঢুকে পড়ছিল তাতে সাহিত্যে দুটো প্রশ্ন গুরুতর হয়ে উঠেছিল। প্রথমটি সাহিত্যে বস্তুসত্যের বিবরণ দেওয়ার প্রশ্ন আর দ্বিতীয়ত সাহিত্যে মানুষের বাস্তব স্থূল ভোগজীবনের কামনাবাসনার প্রশ্ন। এই দুটি প্রশ্নের উত্থাপন যারা করেছিলেন তাদের দাবী খুব দুর্বল ছিল না। তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যধর্ম প্রবন্ধে এই দুই প্রশ্ন এবং তার সঙ্গে বিদেশী সাহিত্যের বেআব্রু আমদানী নিয়েও কথা বলতে হয়েছিল। এবং ক্রমে রবীন্দ্রনাথের পুরানো বিশ্বাসের দুর্গে কোন বড় ফাটল না ধরলেও তাঁর তত্ত্ব চিন্তায় যে পরিবর্তন ঘটেছিল তার প্রমাণও এই 'সাহিত্যের পথে' বইতে আছে।

আধুনিকেরা বাংলা কাব্য সাহিত্যে যেসব নূতন সুর আনতে চেয়েছিলেন শিশির কুমার দাস তাকে খুব মৌলিক বলে মানতে রাজী হন না। " It was not that they were ideologically opposed to Tagore except that none of them had shared his optimism and faith in God ." (A History of Indian Literature, 1911 - 1956, Sahitya Academy, New Delhi, 1995, P - 215) আধুনিকেরা শিল্পে নীতির প্রশ্ন এবং পুরানো বিশ্বাসের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এনেছিলেন। ফ্রয়েড বিশেষ করে এবং কিছু কিছু সমাজ বিজ্ঞানের তত্ত্ব তাঁদের সহায়ক হয়েছিল। আধুনিক কবিতার পক্ষে এই দুই মতাদর্শ অত্যন্ত উপযোগী হয়ে উঠেছিল।

বুদ্ধদেব একদিকে ছিলেন শিল্পের জন্য নিবেদিত প্রাণ মানুষ। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত অথচ সেই রবীন্দ্রনাথকেই শিল্পের জন্য ছেড়ে সরে আসতে হয়েছে তাঁকে। আর এই কারণেই দেখি তাঁর সমস্ত শিল্পী সত্তার একটি অনুপ্রেরণা তাঁর সমস্ত সাহিত্য জীবনের লক্ষ্য হিসেবে কাজ করেছে - তাকে বলতে পারি আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা। এজন্য তিনি যখন 'মেঘদূত' কাব্যের সমালোচনা লিখেছেন সে লেখায় একমাত্র প্রশ্ন ছিল আধুনিক কাব্যের নিরিখে 'মেঘদূতে' র কাব্যমূল্য বিচার। যেভাবে তিনি 'মেঘদূতে' র মৌল কাব্য ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন তা একালের জীবনাদর্শের দিক থেকে না দেখলে বোঝা যাবে না। 'রামায়ণ' সম্বন্ধে যে প্রশ্ন বুদ্ধদেব তুলেছেন তারও মূলে আধুনিকতার একটি মূল প্রশ্ন নিহিত আছে। রাবনের সীতা হরণের উদ্দেশ্য নিয়ে সত্যিকারের কোন সমাধান কোন জায়গায় নেই। অথচ তার উচ্চারিত মীমাংসার চেষ্টাও দেখা যায় না। সূর্পনখার অপমানে ব্যথিত রাবণ সীতাহরণ করতে পারেন কিন্তু মহাকবি তার পরবর্তী কোন সম্ভবনা

সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। এপ্রশ্ন সম্ভবত অনুচ্চারিত থাকাই ভালো বলে অনেকেই মনে করেছেন। বুদ্ধদেবের পক্ষে এপ্রশ্ন তোলা একালের ফ্রয়েডীয় চিন্তানুষঙ্গেই সম্ভব। এজন্য তাঁর মধুসূদন বিচারে লেগেছে কিঞ্চিৎ অনুযোগের সুর। তাঁর আধুনিকতা হয়ে গিয়েছে ছায়াময় এবং তাঁর রচনাবলীও হয়েছে প্রথানুবর্তনের দলিল । বস্তুত মধুসূদনের কবি ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধদেবের আত্মিক যোগ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু। একদিকে এই বাস্তব সম্মত জীবন ধর্মের জন্য তাঁর মনের টান অন্যদিকে সেই মনেরই অভ্যন্তরে অন্য এক অধরা পিপাসা তাঁকে নিয়ত চালনা করে গেছে। সেই জন্য তিনি সহজ প্রাকৃত জীবনের ভিতর থেকে খুঁজতে খুঁজতে চলেছেন সেই চেতনা। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহের ভূমিকা লিখতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন কবিতা রচনা জড়ের সঙ্গে আত্মার দ্বৈরথ। এই অনবচ্ছিন্ন দ্বৈরথই কবির নিয়তি। মনে হয় বোদলেয়ার ছিলেন এ বিষয়ে তাঁর অনুপ্রেরণাদাতা। যখন বোদলেয়রের কাব্য অনুবাদ করেছেন কিংবা তাঁর কবিতার ভূমিকা লিখেছেন তখন তিনি শিখে নিয়েছেন এই প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের মন্ত্র। এইভাবে শিল্পী বুদ্ধদেব প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যে জীবনে এসে পৌঁছেছেন সে জীবন একান্ত নাগরিক । আধুনিক কবিতার প্রকৃতি প্রবন্ধে এই যুদ্ধেরই চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে। বুদ্ধদেবের যে নাগরিক মনোদর্শন সে দর্শন তাঁর রুচিতে তাঁর বিচারে খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। আবার এই ফরাসী কবির সঙ্গে যখন জার্মান কবি রিল্কে আসেন তখন কবি ও তাঁর কাব্যদর্শনের মধ্যে ফুটে ওঠে এক অনাস্বাদিত শুদ্ধতার শিল্পমন্ত্র । বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেবই বোধকরি প্রথম স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে লেখাকে একটা পেশা হিসেবে গ্রহণ করবার দাবী করেছিলেন। ' লেখার ইস্কুল ' সেরকম একটি প্রবন্ধ। সেদিন এরকম দাবী প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত অন্যহ্য বিবেচনা করেছিলেন। এইরকম সর্বতোভাবে সাহিত্য রচনার কাজকে গ্রহণ করার মানসিকতার মধ্যেও এই আধুনিককালের ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্যে আধুনিকতার একটি বড় লক্ষন ছিল সাহিত্যকে কেবল সাহিত্য হিসেবে দেখা। Abrams' তাঁর 'Mirror' and the Lamp' গ্রন্থে একে objective theory বলে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধদেবের সমালোচনার একটি বড়দিক হলো এইযে সাহিত্যকে তিনি শব্দবন্ধের ভিতরে তার নানা কৃতির মধ্যে অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছিলেন। এজন্য তাঁর লেখায় শব্দ আর অর্থের এক নিবিড় দ্যোতনার সন্ধান সবসময়ই থেকে যায় আর এই অর্থময়তার বাইরে থাকে শব্দের ধ্বনি ও ছন্দের রূপ বিন্যাসের আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিচারে সেই কারণে তিনি প্রথম পর্বের কাব্যশিল্পের অধিক গুণগ্রাহী । বুদ্ধদেবের লেখায় রূপের মধ্যে সৌন্দর্য সন্ধান তাঁর সৌন্দর্য চিন্তার একটি বড় দিক। রবীন্দ্রনাথের কথা তুলে এনে এখানে একটি প্রসঙ্গের কথা বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিকেরা সরে যেতে চেয়েছিলেন — বুদ্ধদেবও তাই। তবু তাঁকে তিনি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর সাহিত্য বিচারের যে ধারা তাতে এই রূপবিন্যাসের যে তত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা থেকে তা অনেক আলাদা। একথা ঠিক ' সাহিত্যের পথে ' গ্রন্থে সাহিত্যকে তিনি রূপ সৃষ্টি বলেছেন কিন্তু মনে হয় তার পিছনে সমকালীন প্রণোদনা ছিল একটা বড় দিক। সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেব যে আধুনিকতা প্রবর্তনের কাজ করেছেন তার একদিকে আছে সমকালীন বাংলা

সাহিত্যের পর্যলোচনা করে তার মধ্যে সেই আধুনিকতার ধর্মকে পরিস্ফুট করা এবং তাকে বলবান করা। আর এই কাজে তিনি আধুনিক সাহিত্যের ভালো লেখার সঙ্গে বাংলাদেশের পাঠকদের পরিচয়সাধন করে তার মফস্বলী চরিত্রকে নাগরিক বিস্তার দেবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের চিন্তা বারে বারে প্রতিহত হয়েছে। আগেই বলেছি তিনি নিজে রবীন্দ্রপ্রভাবিত কবি হয়েও বার বার রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। আর তাঁর লেখায় রবীন্দ্রপ্রভাবের দুর্মর ছাপ দেখে ছিলেন হিরণ কুমার সান্যাল । শেষ দিকে তাঁর রবীন্দ্র সমালোচনা নিয়ে বিতর্ক দুই রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ব নিয়েও প্রবল আলোড়ন হয়েছিল। এতে মনে হয় আপাতভাবে বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র চিন্তার মধ্যে কোথাও দ্বিধা ছিল। তবে আমাদের ধারণা প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই ছিল তাঁর মনের সমর্থন। যেহেতু বিশুদ্ধ কাব্যবাদী শিল্পী তিনি, তাই পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের রচনা তাঁকে তেমন আগ্রহান্বিত করে নি। এই কারণে নূতনকালের বিচারেও বুদ্ধদেব আর বেশীদূর গ্রাহ্য হননি। নূতনকালের কবিতায় এসেছিল সচেতন সমাজদ্রোহ। অথচ সমাজকে সাহিত্যের বিষয় হিসেবে ভাবতে তিনি তেমন রাজী ছিলেন না । ফলে সাহিত্যের নিত্যগত প্রশ্নগুলি থেকে যখন সরে গিয়ে তা সমাজ বিপ্লবের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হলো তখন বুদ্ধদেবের সমালোচনা প্রবন্ধগুলি সীমাবদ্ধ সাহিত্য পরিসরে নিবদ্ধ হয়ে রইল।